মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ঃ সৃজনে ও মননে

বিষ্ণু বসু

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য যখন প্রয়াত হন ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল দেশের বামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলো, এমনকি 'সোভিয়েত জগত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বিশেষ শোকবার্তা, তাঁরা সন্তপ্ত হয়েছিলেন বন্ধুবিয়োগে, এ সকল তথ্য কৌতুহলী পাঠকমাত্রেই জানেন। একজনঅভিনেতা যিনি আজীবন জড়িয়ে ছিলেন প্রধানত পেশাদারী রঙ্গালয় ও চলচিচত্রের সঙ্গে, তাঁর প্রয়াণে আদর্শের দিকথেকে একেবারে বিপরীত মেবাসী দুটি তরফের যুগপৎ সশ্রদ্ধ স্মরণ সেকালেও কম বিস্ময়ের ছিল না। অবশ্য আজথেকে প্রায় ছত্রিশ বছর অ াগে জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলো সাম্প্রতিকের মত একটা নির্লজ্জ ছিল না, কিন্তু বামপন্থা সম্পর্কে তাঁদের সংশয় ও ত্রে াধ তখনও বেশ ভালই ছিল। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মৃত্যুর ত্রিশ বছর আগে যখন প্রয়াত হন শ বিপ্লবের প্রধান স্থপতি লেনিন, কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকা লিখেছিল, ''দ্যাট নটোরিয়াস বলশেভিক লিডার লেনিন ইজ ডেড''। তারপর মধ্যবর্তী ত্রিশ বছর এবং তার পরেও বামপন্থায় বিশ্বাসী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর বীতরাগ শমিত হয় নি বিন্দুমাত্র। এমন পরিস্থিতিতে 'শুধুমাত্র একজন অভিনেতা'র জন্যে এধরনের শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বভাবতই বিস্মিত করে আমাদের। কেননা বামপন্থার প্রতি অনুরাগ,সুধু অনুরাগ কেন পক্ষপাতই বলা যায় এ মনোভাবকে, মনোরঞ্জ ন গোপন করে চলেন নি কখনও। তাই মনস্বী অভিনেতা 'মহর্ষি'র শতবর্ষ পালনে ব্রতী হয়ে আমরা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব কোন্ কোন্ বিশেষ গুণ ও চারিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল মনোরঞ্জনের অনন্যতা।

জন্ম হয়েছিল পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামে, দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। ভাল ছাত্র ছিলেন, এন্ট্রান্স পরীক্ষারপাশ করেছিলেন প্রথম বিভাগে, ঢাকা জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে। সুপুষ ছিলেন, সকলের প্রিয়। এ হেন মানুষ প্রচলিত শিক্ষা সম াপ্ত করে ভাল চাকরি জোগাড় করে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন নিপদ্রব ভাবে বহু বাঙালির মত, কিন্তু সে ধরনের স্বচ্ছন্দ দিনাতিপাত পছন্দ ছিল না তাঁর একেবারেই, তাই নিতান্ত তণ বয়সেই জড়িয়ে পড়েছিলেন স্বদেশী ক্রিয়াকর্মে। সভ্য হন সেকালের অনুশীলন সমিতির, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আনবার বাসনা ছিল যাঁদের। সংস্পর্শে এসেছিলেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের যিনি 'বাঘা যতীন' নামে খ্যাত বাঙালির কাছে। সেই প্রবল ইংরেজ আমলে এ পথ নির াপদ ছিল না, তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই বরণ করেছিলেন নির্যাতন অথবা মৃত্যু। মনোরঞ্জনকেও ভোগ হয়েছিল কার াদণ্ড, লেখাপড়ায় যার জন্যে ছেদ পড়েছিল বহুবার। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীন 'ন্যাশনাল কলেজ' থেকে ভাল ফল নিয়ে পাশ করেছিলেন এফ এ পরীক্ষার সমতুল্য মান। তারপর কিছুকাল চাকরি, শিক্ষকতা এবং আবার পড়া। স্নাতক পরীক্ষাতেও বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। তার তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না পরিবার পরিজন নিয়ে নিশ্চিন্তে জীবন কাটিয়ে দেওয়া। তিনি কিন্তু তা করেন নি। বরং বরণ করে নিয়েছিলেন অতিশয় অনিশ্চিত অভিনেতার জীবন এবং এ কৃতকর্মের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ও দায়বদ্ধতা। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, সেকালে যাঁরা বেছে নিয়েছিলেন নট জীবন তাঁরা সকলেই ছিলেন অনুরূপ ভাবনায় ভাবিত। সে আমলে এমন অনেক কৃতবিদ্য পুষই সুনিশ্চিত জীবিকার পথ ছেড়ে এসেছিলেন অভিনয় করতে, শিশির কুমারের মত কেউ অধ্যাপনা ছেড়ে, নরেশ মিত্রের মত ওকালতি ছেড়ে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে সত্যের খাতিরে, এ সকল বরেণ্য অভিনেতাদের মধ্যে বোধ করি একজনও ছিলেন না সমাজনীতি অথবা রাজনীতিমনস্ক, মনোরঞ্জনের মত। তাই মনোরঞ্জনের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল, তাঁর সমকালীনদের তুলনায়, ভবিষ্যত প্রগতিশীল শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া। পেশাদার মঞ্চের বলয়ে তাঁর এ উত্তরণ সহজ ছিল না ঐতিহাসিক কারণেই।

মনোরঞ্জন 'মহর্ষি' নামে খ্যাত হয়েছিলেন শিশির কুমার পরিচালিত 'সীতা' নাটকের 'মহর্ষি' বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করে। অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন উত্তরকালে এ প্রসঙ্গে, "শিশিরবাবুর কথা বাদ দিলে, সব চাইতে যাকে ভাল লাগল, তিনি হচ্ছেন--- বাল্মীকি---মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। এমন ভঙ্গিতে উনি কথাবার্তাগুলি বললেন, এমন হাবভাবের সঙ্গে উনি অভিনয় করলেন যে আমাদের চোখে তা নতুন লাগল। মনে হল, এরকম বিশেষ বাচন ভঙ্গিতে আমরা অভিনয় করি না। সঙ্গে সঙ্গে এ - ও মনে হয়েছিল, তাঁর প্রতিটি চলাফেরা, তাঁর অভিনয় চরিত্রটির সঙ্গে একেবারেখাপ খেয়ে গেছে।... এমনই ছাপ উনি দিয়েছিলেন, সেই থেকে মনোরঞ্জনবাবুর থিয়েটার মহলে নামই হয়ে গেল---মহর্ষি'।" থিয়েটারের চরিত্র দিয়ে সেকালে অভিহিত হতেন অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। আমরা এখানে যে বিষয়টির উপর জোর দিতে চাই তা হল সেকালে সম্ভবত অন্য কোনও ব্যক্তিত্ব যান নি রাজনীতি থেকে রঙ্গালয় এবং রঙ্গালয় থেকে ক্রমে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন নি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে 'মহর্ষি' মনোরঞ্জনের মত। কথাগুলো বোধ হয় একটু বিশ্লেষণের দরকার আছে।

আগেই বলা হয়েছে, অনুশীলন দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন মনোরঞ্জন তাঁর তণ বয়সে। তারপর মহাত্মা গান্ধীর ড াকে অসহযোগ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কংগ্রেসী আদর্শে স্থিত থাকেন নি বেশিদিন, যদিও খদ্দরের পে াশাক পরে গেছেন সারাজীবন। দেবনারায়ণ গুপ্তের একটি লেখা থেকে জানতে পারি, মনোরঞ্জন "খদ্দরের থ্রি-কোয়ার্টার পাঞ্জাবির সঙ্গে একটি খদ্দরের ধুতি কেটে দু-খানি লুঙ্গি তৈরি করে তারই একটি পরে আসেন।" কংগ্রেসী আদর্শে বিশ্বাস নিয়ে খদ্দর পরতেন না তিনি। এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "একটা কাপড় কেটে দু-খানা করে পাড়লে অর্থের যেমন সাশ্রয় হয়, অপরদিকে তেমনি ঋনের দায় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।" তিনি মনে করতেন, "যেদেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার, সেখানে ভাল জামাকাপড়ের প্রশ্নিরর্থক।" আমাদের দারিদ্র ক্লিষ্ট দেশবাসী স ম্পর্কে যাঁর ছিল এক ধরনের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ, তাঁর রাজনৈতিক মতযে ক্রমে নিয়ন্ত্রণ করবে তার সমগ্র শিল্প চেতনাকে, নিজেকে ক্রমে জড়িয়ে ফেলবেন প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে তা বোধহয় বিস্ময়ের নয়।

কিন্তু তবু একটু বিস্ময় থেকেই যায়, অন্তত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের বিষয়ে। কেননা পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে আদ্যোপান্ত জড়িত থেকে তিনি ঝুঁকে পড়বেন বামপন্থার দিকে এটা সহজ ছিল না সে আমলে। কেননা পেশাদার রঙ্গালয়ের কতগুলো রীতি (norm) অনুসৃত হয়ে আসছিল সে যুগে এবং রীতিগুলো নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন মুলত গিরিশচন্দ্র সেই ঊনিশ শতকেই। একথা এখন আর নতুন করে আলোচনা করার দরকার নেই যে, গত শতকে বাঙালি জীবনে যে রেনেসাঁস হয়েছিল তার গণ্ডি সীমিত ছিল মধ্যবিত্তদের মধ্যে। আসলে এই নবজাগরণ ছিল বাঙালি ভদ্রলোকের। ইউরোপীয় রেনেসঁ াসের স্বভাবের সঙ্গে আমাদের নবজাগরণকে মেলানো কঠিন। কেননা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মুল কথাই ছিল স ামন্ততন্ত্রকে ধবংস করে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং তার অভিঘাতে নানা গণতান্ত্রিক ধারণার উদ্ভব। পুরনো শ্রে ণীবিন্যাসকে বদলে দিয়ে নতুন শ্রেণীবিন্যাসের প্রতিষ্ঠা সে মহাদেশে সহজে হয়নি। কোনও দেশেই অর্থনৈতিক মূল কাঠামে ার বদল ঘটানো সহজ নয়। তার জন্যে দরকার সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এ পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে। সামাজিক কাঠামো পরিবর্তিত হতে পারে অর্থনৈতিক কাঠামো বদলাতে পারলে এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর বদল ঘটাতে পারে রাজনৈতিক আন্দোলন। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ইতিহাস আসলে এ ধরনের আন্দোলনসমূহের সামগ্রিক ইতিহাস। এ আন্দোলনের ফলেইইউরোপে বুর্জোয়া মতাদর্শের বিকাশ ঘটেছিল। অ াবার বুজোয়া মতাদর্শের বিদ্ধেই সংগঠিত হয়েছিল সাম্যবাদী আন্দোলন।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের কল্যাণেই এদেশে বুর্জোয়া আন্দোলন সঠিক অর্থে সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। ইংরেজরা ভারত অধিকার করেছিল এদেশের সম্পদ লুঠ করবার জন্যে। তার ফলে এদেশের অর্থনীতি কোন পরিণতিতেপৌঁছেছিল তার তথ্যসম্বলিত বিবরণ বহু বইতেই পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে তা আর উদ্ধৃত করা হচ্ছে না। ব্যবসায়ীইংরেজের কাছে ভ ারত ছিল কাঁচামালের যোগানদার ও ব্রিটিশ পণ্যের বাজার। পরাধীন ভারত কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য থাকত কাঁচাম

াল, আবার পণ্য বিলেত থেকে এলে বেশি দামে কিনতে হত এদেশবাসীকে। ব্যবসায়ী ইংরেজ নিজের স্বার্থেই চায়নি যাতে কলকাখানা গড়ে উঠতে পারে এদেশে। এমনকি যে বস্ত্রশিল্পের জন্যে বাংলার ছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতি তাও নির্মমভাবে ধবংস করল ইংরেজ। অন্য সব কুটিরশিল্পের একই দশা হল। কুলকর্ম থেকে উৎখাত হয়ে এসব মানুষ স্বভাবতই ভিড় করল জমিতে। অথচ মান্ধাতার আমলের চাষের যন্ত্র ও আনুষঙ্গিকের বদল ঘটল না। ফলে এদেশের অর্থনীতিতে শু হল বিপর্যয়ের পালা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে এ বিপর্যয়কে আরও দগদগে করে তোলা হল। সৃষ্ট হল নতুন জমিদ ারশ্রেণী ও শাসকদলের অনুগ্রহপুষ্ট আরও কিছু মধ্যসত্ত্ব ভোগী। মূলত এঁরাই পেলেন পাশ্চাত্যশিক্ষা। তাই তাঁদের শ্রে ণীস্বার্থ ছিল প্রধানত ইংরেজদের সঙ্গে বাঁধা। বাংলার নবজাগরণের ধারক ও বাহক ছিলেন কিন্তু এঁরাই। তাই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো পাল্টাবার কথা এঁরা ভারতেই পারতেন না এবং এঁদের রাজনৈতিক আন্দোলনও, অন্তত ঊনিশ শতকে সীমাবদ্ধ ছিল,প্রধানত কিছু মানবিক অধিকার লাভের দাবীদাওয়ার মধ্যে। এসব দাবীর মধ্যে প্রধান ছিল ইংরেজের সমতুল্য রাজপদ অথবা বিচারবিভাগীয় সমতা। অবশ্য এসব দাবী মেনে নেওয়াও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের পক্ষে ছিল অসম্ভব। অথচ বিদেশী শোষণের ফলে ভারতের কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল এবং সারাদেশে দেখা দিচ্ছিল কৃষক বিদ্রোহ, অবশ্য তারা ছিল বিচ্ছিন্ন।ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে দানা বাঁধছিল বিস্ফোরণের পরিস্থিতি। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গে বিক্ষুব্ধ এ শ্রমজীবীদের যাতে আদর্শগত আদানপ্রদান না ঘটে তাঁর জন্যে ইংরেজদের চেষ্টার শেষ ছিল না। তাই ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ানের উদ্যোগে স্থাপিত হল জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেস ইংরেজের হয়ে সেফটি ভাল্ব-এর কাজ করছে দীর্ঘকাল ধরে।

যে কোনও ধরনের অর্থনৈতিক আন্দোলন সঙ্গত কারণেই আর এ দেশে দানা বাঁধতে পারে নি গত শতকে। রাজনৈতিক অ ান্দোলনের পরিধিও, অন্তত মধ্যবিত্তদের কাছে, ছিল সীমাবদ্ধ। তাই আমাদের নবজাগরণের যুগে বাঙালির চিন্তা ও উদ্যমের প্রায় সবটাই খরচ হয়েছে বিবিধ সমাজ সংস্কার, ধর্ম নিয়ে আলোচনা ও শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে। এশিক্ষার স্বর ূপও ছিল মূলত শাসক শ্রেণীর দরকারে প্রযুক্ত শিক্ষা এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে তা ছিল অনধিগম্য। অর্থাৎ আম াদের শ্রেণীবিন্যাস মধ্যবিত্তদের সংবৃত রাখল অথবা রাখতে বাধ্য করল শুধু ধর্ম ও সমাজ সংস্কারেরমধ্যে। এবং তার সঙ্গে মিলিত হল অপরিণত রাজনৈতিক মত। অবশ্য এসবের মধ্য দিয়েও প্রবর্তনা ঘটেছিল বেশকিছু ইতিবাচক বোধের। মানবত াবাদের প্রতি মনস্কতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ধর্ম নিয়ে নতুন যুগের উপযোগী ভাবনা এবংসমাজসংস্কারের প্রতি আন্তরিক আগ্রহ জা তির জীবনে যথার্থই কিছু পরিবর্তন এনেছিল। তার সুফল দেখা গিয়েছিল বাঙালির সাহিত্য ও শিল্প। কিন্তু অর্থনীতিই যে সমাজের নিয়ামক শক্তি এবং এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোই যে ইংরেজ শাসনে পঙ্গু হয়ে পড়ছে এ ধারণা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও তেমন করে দানা বাঁধেনি।

বাংলা থিয়েটার সৃষ্টি হয়েছিল এ পরিকাঠামোতেই। এবং এ থিয়েটারের নিঃসংশয় জনক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অপরেশচন্দ্রের ভাষায় বাংলা থিয়েটারের আর কেউ "খুড়া জ্যাঠা ছিলেন না।" গিরিশচন্দ্র এ অভিধা পেলেন কেন? পেলেন এই কারণেই, কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্তের যাবতীয় মানসিক উচচাবচতা তার সার্থকতা ও ব্যর্থতা নিয়ে ধরা পড়েছিল তাঁরই নাটকে। তাই তাঁর পৌরাণিক নাটকে পরিবেশিত হয়েছে ভক্তিরস, ঐতিহাসিক নাটক লিখতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন অগভীর দেশপ্রেমের কাছে, সামাজিক নাটকে ধরা পড়েছে সামাজিক মূল্যবোধের কিছুপ্রচলিত ধারণ া। সমাজ ও ব্যক্তির তির্যক সম্পর্ক, তার অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত তেমন নান্দনিক জটিলতাহসমূহ দেখা যায় না তাঁর রচনায়। কেননা তাঁর সমকালীন বাঙালি মধ্যবিত্ত দর্শক এ জটিলতাকে স্বীকারের যোগ্য হয়েওঠে নি তখনও। স্বামী বিবেকানন্দ যতই তাঁর 'বিল্বমঙ্গলকে' স্থান দিন শেকসপীয়রের উপরে, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর সামাজিক নাটকগুলোকে শিরোপা দিন ইবসেনের সঙ্গে তুলনা করে, কিন্তু শতাব্দীর ব্যবধানে গিরিশচন্দ্রের এ নাটকগুলো আর তরঙ্গ তোলে না অ াধুনিক মননে। তবু গিরিশচন্দ্রই সেই ব্যক্তিত্ব, যাঁর নাটকে নির্ভুলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ঊনিশ শতকী বাঙালির মধ্যবিত্ত মানসিকতা। মনে রাখতে হবে গিরিশচন্দ্র কখনও লেখেননি বা মঞ্চস্থ করেন নি 'চা কর দর্পণ' অথবা 'জমিদার দর্পণে'র মত নাটক। 'চোখের বালি'-র নাট্যরূপ প্রযোজনা করতে অস্বীকার করেছিলেন কেননা তাতে নাকি "নর্দমা ঘাঁটা"

হয়।

শিশিরকুমার যখন প্রবলভাবে আবির্ভূত হলেন বাংলা সাধারণ রঙ্গলয়ে বিশ শতকের বিশের দশকের গোড়ায়, তিনি কিন্তু পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করলেন গিরিশ - নির্ধারিত নাট্যরীতিnorm -এর কাছেই। বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন তিনি, প্রযোজনায় সংস্কার ঘটিয়েছিলেন বিস্তর, পরিচালনায় এনেছিলেন পরিশীলিত মনন, কিন্তু আশ্চর্যভাবে বাঁধা পড়েছিলেন বিগত যুগের নাট্যমানসিকতার কাছে। তাই তিনি ক্রমাগত প্রয়োজনা করে গেছেন গিরিশযুগের গতানুগতিক নাটকগুলোকে, তাঁর অসাধারণ অভিনয়প্রতিভা তৈরি করতে পারেনি তেমন কোনও নতুন নাটককার। যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা', যা নিয়ে শু হয়েছিল বাংলা নাট্যজগতে তাঁর অপ্রতিহত জয়যাত্রা, রবীন্দ্রনাথের অভিমতঅনুযায়ী নাটকই ছিল না সেটা। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলোর নাট্যরূপ প্রযোজনার মধ্য দিয়েও প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর মধ্যবিত্ত মানসিকতার কাছে আত্মসমর্পণ। অবশ্য তিনি বাংলা মঞ্চে উপস্থাপিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রহসনএবং জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল সেগুলো, কিন্তু যখনই প্রযোজনা করতে গেছেন 'বিসর্জন' অথবা 'তপতী', শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা। জানা যায় একবার 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করার বাসনা নাকি তাঁর হয়েছিল, কিন্তু বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিলেন এ প্রচেষ্টা, সম্ভবত সামর্থ্যের ন্যূনতার কথা ভেবেই। তাই শেষ জীবনে যতই কেননা ক্ষোভ প্রকাশ কণ তিনি 'হালুমগীর' ও 'ঘুঘুবীর' প্রভৃতি নাটক নিয়ে, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে সত্যের খাতিরে যে 'নবান্ন' নাটকের প্রযোজনা - সাফল্য খুশি করে নি তাঁকে এবং শেষ জীবনে যদিও যুগের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে প্রযোজনা করেছিলেন তুলসী লাহিড়ীর নাটক 'দুঃখীর ইমান' তাঁর 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে, কিন্তু নিজে অংশ নেননি কোনওভুমিকায়।

এ প্রতিপাদ্যের মধ্য দিয়ে কিন্তু অস্বীকার করা হচ্ছে না শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভাকে ক্ষমতাবান শিল্পী তিনি ছিলেন অবশ্যই। আসলে আমরা বলতে চাইছি, শিশিরকুমার মূলত আত্মসমর্পণ করেছিলেন তাঁর সার্থক পূর্বসুরীর কাছে।গিরিশচন্দ্রের থিয়েটারে তৈরি হয়েছিল যে বাঙালি মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ এবং যা একান্তভাবেই ছিল ঊনিশ শতকী,সেই পরিমণ্ডলের বাইরে আসতে পারেন নি শিশির কুমার। অথচ তাঁর স্বীকৃতি ছিল মননশীল বিদগ্ধ ব্যক্তি বলে, বন্ধুও অনুগামী হিসেবে পেয়েছিলেন সমকালীন চিবান ও শ্রেষ্ঠ মানুষদের, কিন্তু তিনি আশ্চর্যভাবে উদাসীন ছিলেন সমকালীনতার প্রতি। তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি যুগোপযোগী নাটকের ভাষা সৃষ্টি করা। স্বকালের ক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তিগুলোর প্রতি অবহেলাই তাঁকে এ মানসিকতা দিয়েছিল।

গিরিশচন্দ্র প্রয়াত হন ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিজেন্দ্রলাল ১৯১৩-তে। গিরিশযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট অমরেন্দ্রনাথ বিগত হন ১৯১৬-য়। গত শতকের মূল্যবোধে আবদ্ধ নট ও নাটককারদের মধ্যে রইলেন অমৃতলাল ও ক্ষীরোদ প্রসাদ। কিন্তু তাঁরা ছিলেন যথেষ্ট প্রবীণ, তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না নতুন যুগের সঙ্গে সমতালে চলা। এ প্রেক্ষিত মনেরাখলে দেখা যাবে শিশিরকুমার পেয়েছিলেন এমন একটি মঞ্চ যা নতুনকে বরণ করে নেবার জন্যে ছিল সাগ্রহে তৈরি। সৃজনশীলতা সব সময়েই পুরনোকে স্বীকরণ করেই হয় সার্থকতার পথে, কিন্তু শিশিরকুমর নিজেকে প্রায় নিঃশেষে উৎসর্গ করেছিলেন পুরনোর কাছেই। কারণ তিনি ইতিহাসের গতি অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

আসলে বিশ শতকের বিশের দশক থেকেই ভাঙন শু হয়েছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ ও মানসিকতায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, জমি থেকে আয়ের সীমাবদ্ধতা, ক্রমবর্ধমান বেকারি, চাকুরিলাভে সুযোগের সংকট ক্রমে গ্রাস করছিল বাঙালি মধ্যবিত্তকে। ভারতের রাজধানী কলকাতা আগেই স্থানান্তরিত হয়েছিল দিল্লিতে, গান্ধীজীর আবির্ভাবে কংগ্রেসী রাজনীতির নেতৃত্বের কেন্দ্রও অপসারিত হল বাংলা থেকে। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে এবং নিজেদের অজ্ঞতায় তৈরি হতে লাগল হিন্দু - মুসলমান বিচ্ছেদের ফাটল, এক সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের মুখোমুখি হতে লাগল অবিভক্ত বাংলা। কিন্তু বাংলা নাট্যজগৎ রইল তার প্রতি আশ্চর্যজনকভাবে উদাসীন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' 'রক্তকবী' থেকে 'কালের যাত্রা' পর্যন্ত বেশ কিছু নাটকে প্রতিফলিত হল একালের সংকট কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো তখনও বাংলা মঞ্চে প্রায় অস্পৃশ্য।

অথচ প্রক্রিয়া চলছিল, পটভূমি তৈরি হচ্ছিল। শবিপ্লবের অভিঘাতে ঐ শতকের বিশের দশকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভ ারতের কমিউনিস্ট পার্টি। কানপুর মীরাট মামলা তাঁদের ব্যাপক পরিচিত এনে দিল ত্রিশের দশকের মধ্যেই। ১৯৩০ খ্রিস্ট াব্দে হল রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক সোভিয়েত সফর যার বিশ্লেষিত বিবরণ বেল 'রাশিয়ার চিঠি'তে এবং অচিরেই নিষিদ্ধ হল ইংরেজি সংস্করণ ব্রিটিশ আইনের বলে, কিন্তু বাংলা রঙ্গমঞ্চে তার বিন্দুমাত্র চিহ্ প্রতিফলিতহল না। এমন কি ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি ইউরোপে ফ্যাসিবাদী শক্তির অভ্যুদয়ে শঙ্কিত হয়ে এখানে প্রতিষ্ঠিত হল 'প্রগতি লেখক সংঘ', সেখানেও বাংলা রঙ্গমঞ্চের মহারথীরা রইলেন আশ্চর্যজনক ভাবে অনুপস্থিত। বিশ ওত্রিশদশকের বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রযো জিত নাটকগুলো লক্ষ্য করলেই প্রমাণিত হবে আমাদের সিদ্ধান্তের সারবত্তা।

শুধু বিরলতম ব্যতিক্রম মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ১৯৪১-এর ২২ জুন হিটলারের নাৎসি বাহিনীর রাশিয়া আক্রমণের প্রতিব াদে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। এ সমিতির সভাপতি হলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যুগ্মসম্পাদক অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যয় ও স্নেহাংশু আচার্য এবং অন্যতম সক্রিয় সদস্য হলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। শুধু তাই নয়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল বামপন্থায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল পত্রিকা 'অরণি', এখানেও মননশীল লেখক হিসেবে দেখা দিলেন তিনি। অনুশীলন সমিতি থেকে কংগ্রেস ছুঁয়ে মনোরঞ্জন স্থিত হলেন বামপন্থায়। এমন উত্তরণকেই বোধ হয় বলা যায় ত্রান্তিচিহ্নিত।

আবশ্য এ সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে কিন্তু একথা বলা হচ্ছে না যে, মনোরঞ্জনই ছিলেন বাংলার একমাত্র ব্যক্তি যিনি জীবনের গে াড়ায় সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী দল অনুশীলন সমিতি পরে কংগ্রেস থেকে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসকে ন্যস্ত করেছিলেন বামপন্থ ায়। আমরা জানি বাংলার বহু বিপ্লবী মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন আন্দামানে বন্দী থাকার সময়ে।ত্রিশের দশকের প্রায় শুতেই মেদিনীপুর শহরে পর পর তিনবছর তিনজন ইংরেজ জেলাশাসক নিহত হন বিপ্লবীদের হাতে। এসব বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ কেউ মারা যান ঘটনাস্থলে গুলিতে, ফাঁসির শহিদ হন বেশ কয়েকজন এবং বেশ কিছু বিপ্লবী তণকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আন্দামানে। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন সূর্য সেনের নেতৃত্বে তাঁদেরও অনেকে প্রেরিত হন আন্দামানে। তাছাড়া অন্য অনেক বিপ্লবীর স্থান হল সেলুলার জেলে। সেখান থেকে সেই দুর্বহ অবস্থার মধ্যেও বেশ কিছু তণ দীক্ষিত হন মার্কসবাদে। মেদিনীপুরে প্রথম জেলা শাসক পেড়ির হত্যাকারী বিমল দাশগুপ্তের কাছে শুনেছিলাম তাঁদের এই উত্তরণের ইতিহাস। বার্জ হত্যা মামলার অপরাধে দ্বীপান্তরিত হন সুকুমার সেনগুপ্ত। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মেদিনীপুর জেলার সম্পাদক তিনি দীর্ঘকাল ধরে। গণেশ ঘোষ, যাঁর জন্যে এখন কংগ্রেসীরাও কুম্ভীরাশ্রু ফেলেছেন এবং যঁ ার বহুদিন কেটেছে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী কারাগারে, তিনিও কমিউনিস্ট হন আন্দামানেই। এমন বহু উদাহরণ রয়েছে। আবার, প্রথম জীবনে কংগ্রেস করেও কমিউনিজমে বিশ্বাস ন্যস্ত করেছেন এমন নজিরও কম নেই। বিনয় চৌধুরী এ সরোজ মুখোপাধ্যায়ের কথা অনেকেরই মনে পড়বে এ প্রসঙ্গে। তাই মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের বিশ্বাসের উত্তরণকে নিশ্চয়ই বলা যাবে না সম্পূর্ণ একক ও নজিরবিহীন। তবু তার কৃতকর্মকে ত্রান্তিচিহ্নিত বলা হচ্ছে শুধু এই কারণে যে, পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে আদ্যোপান্ত জড়িত থেকেও একমাত্র তিনিই বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিলেন সাম্যবাদে, স্বাধীনতারও অনেক আগে। তাঁর সমক ালীন পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিখ্যাত অভিনেতাদের সম্পর্কে সামান্য খোঁজখবর রাখেন যাঁরা, তাঁদের ক াছেওবিষয়টি অবশ্যই কম বিস্ময়ের নয়। স্থিত কাঠামো ও নির্দিষ্ট বলয় থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে চাই প্রবল মানসিক শক্তি ও দায়বদ্ধতা। মনোরঞ্জন তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রে এ শক্তি ও দায়বদ্ধতার প্রতীক।

এ দায়বদ্ধতার পরিচয় রয়ে গেছে তাঁর লেখা কয়েকটি নাটকে ও বেশ কিছু প্রবন্ধেঅভিনেতা মনোরঞ্জনের স্মৃতি প্রায় ধূসর হয়ে এসেছে বর্তমান প্রজন্মের কেননা 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'। সেলুলয়েডে অবশ্য বন্দী আছে অভিনেতা মনোরঞ্জ নের কৃতি, কিন্তু সেগুলো বেশির ভাগই সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য এবং তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন সঠিক মনোরঞ্জনকে। ক ারণ তার প্রায় সবগুলোই জড়িত ছিল শুধু জীবিকার সঙ্গে। তাই মননশীল মনোরঞ্জনকে আমাদের অন্বেষণ করতে হবে তঁ

ার রচনায়।

অর্থনীতি সমাজ ও শিল্পের পারস্পরিক একাত্মতার কথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বিশের দশকের শেষ দিকেই। 'আম াদের থিয়েটার' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন পাশ্চাত্যদেশে "অভিনয়ের এই দর্শক নিরপেক্ষতা সম াজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চলেছে বলেই চলেছে, আর আমাদের পুরাতন ধারা অর্থনীতির প্রতিকূলে গিয়ে থেমে গিয়েছে।" একথাগুলো তিনি লিখেছিলেন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের উপান্তে বসে যখন বাংলা মঞ্চে অপ্রতিহত র াজত্ব করছেন শিশিরকুমার। অবশ্য ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন এই প্রবন্ধে, "এদেশের বর্তমান অবস্থায় কোন জিনিষই ভাল হয়ে গড়ে উঠল না, খামোখা থিয়েটারই বড় হয়ে গড়ে উঠবে কেন?" আমাদের জাতীয়জীবনে সর্বব্যাপী অবক্ষয় যে তাঁকে নিতান্ত পীড়িত করছিল তার প্রমাণ এ প্রবন্ধ।

তাঁর প্রবন্ধের বই 'থিয়েটার প্রসঙ্গে' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' -এর তরফে। এ বইতে ছিল তেরটি প্রবন্ধ। এগুলো কোন্ সময়ে রচিত হয়েছিল তার কোনও উল্লেখ নেই এ বইতে। তবে অনুমান করা যায় এসব প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৩০ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। সম্প্রতি বইটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে আরও কিছু প্রবন্ধ সহ। এসব লেখার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর দায়বদ্ধ মনন।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সম্ভবত নাটক লিখেছিলেন পাঁচটি। তার মধ্যে চারটি 'চক্রব্যূহ', 'ব্রতচারিনী','দেশবন্ধু' ও 'বন্দনার বিয়ে'--- মঞ্চস্থ হয়েছিল পেশাদারি মঞ্চে। অন্য একটি ছোট নাটক 'হোমিওপ্যাথি'--ষ্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়ফ্যাসিবিরো ধী লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে ১৯৪৪ -এ। একই সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'। হোমিওপ্যা থি'কে একটি প্রচার নাটকই বলা চলে। কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতার বিদ্ধে লেখা হয়েছিল এ নাটকটি। ওলাওঠ ায় গ্রাম উচ্ছন্নে যাচ্ছে অথচ স্তুতিরত্নের মত স্বার্থপর ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকেও মৃত্যুরও দিকে ঠেলে দিয়েছে কুসংস্কার ও ধর্ম ান্ধতার দন। হিন্দুর কীর্তন ও মুসলমানের নামাজ নিয়ে সৃষ্ট হয়েছে দাঙ্গার পরিবেশ,শেষ পর্যন্ত অবশ্য জাপানী বোমার ভয় দুটি সম্প্রদায়কে সাময়িকভাবে হলেও মিলিত করেছে। এ নাটকের সমাপ্তিতেঅন্যতম চরিত্র নিবারণ বলেছে, "আমরা এককাট্টা হলে বোমা থেকে আত্মরক্ষাও করতে পারব। আর বোমা যদি কোনদিন নেমে আসে, তাদেরও জব্দ করতে প ারব। চীনেরা আমাদেররই মত অসহায় ছিল ভাই, কিন্তু এককাট্টা হয়ে এই দুষমণ বোমাদেরও জব্দ করে দিচ্ছে।" পঁয়তা ল্লিশ বছরের ব্যবধানেও সংলাপটি আমাদের দেশের পক্ষেসমান সত্য রয়ে গেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল এ নাটক মঞ্চস্থ হবার দুবছরের মধ্যেই সারা দেশে দেখা দিয়েছিল আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তার পরিণামে দেশভাগ। ইংরেজদের কুটনীতি ও আমাদের নেতাদের অবিমৃষ্যকারিতার দায়ভাগ এখনও বহন করতে হচ্ছে বাঙালিকে।

'বন্দনার বিয়ে' মঞ্চস্থ হয়েছিল 'শ্রীরঙ্গমে' ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর, ঝিনাথ ভাদুড়ীর পরিচালনায়। কেউ কেউ অবশ্য লিখেছেন নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন শিশিরকুমার। কিন্তু হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' বইতে উল্লেখ করেছেন ঝিনাথ ভাদুড়ির কথা। হেমেন্দ্রনাথের কথাই গ্রাহ্য বলে মনে হয় কেননা প্রকাশিত হলে নাটকটি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য উৎসর্গ করেছিলেন ঝিনাথ ভাদুড়িকেই। তাছাড়া নাটকটি পড়লেই উপলব্ধ হবে ঠিক এ ধরনের নাটকে স্বস্তি পেতেন না শিশিরকুমার। নারীমুক্তি নিয়ে যে অস্তর্থ্যক মানসিকতা ও স্থান বিশেষে প্রায় বিধবংসী মতামত প্রকাশ পেয়েছে ন াটককারের তাতে শিশিরকুমারের সমর্থন ছিল কিনা সন্দেহ। অবশ্য শিশিরকুমারও তখন গণনাট্য সংঘের প্রবল আবির্ভ াবের অভিঘাতে, কিছু নতুন ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করবার দিকে ঝুঁকেছিলেন।কিন্তু এ ব্যাপারে যে তাঁর তেমন মানসিক সায় ছিল না সে কথা অলোচিত হয়েছে 'দুঃখীর ইমান' প্রযোজনার প্রসঙ্গে।'বন্দনার বিয়ে'তে মনোরঞ্জন সম্ভবত পীতাম্বরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

কিন্তু এসবেরও এক দশক আগে, তখনও প্রতিষ্ঠা হয় নি প্রগতি লেখক সংঘের, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

‘চত্রব্যুহ’ নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। কাহিনী মহাভারত থেকে নেওয়া। কেউ কেউ অনুমান করেছেন নাটককার ভ াসের ‘পঞ্চরাত্রম্’ -এরও ছায়া আছে এ নাটকে, কিন্তু মনোরঞ্জন তাতে আরোপও করেছিলেন যুগোপযোগী তাৎপর্য। ‘ন াট্যনিকেতন’ থিয়েটারে এ নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন কর্ণ---মনোরঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণ---ভূপেন চত্রবর্তী, যুধিষ্ঠির---পশুপতি সামন্ত, ভীম---নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অর্জুন---সন্তোষ সিংহ, শকুনি---অহীন্দ্র চৌধুরী, দ্রোণাচার্য--- তুলসী চত্রবর্তী, অভিমন্যু---নীহারবালা, কুন্তী---তারাসুন্দরী, দ্রৌপদী---চাশীলা, উত্তরা---সরযুব ালা, সুভদ্রা---ঊষা। এবং আরও অনেকে।

তখন ইউরোপে শু হয়েছে ফ্যাসিবাদী তাণ্ডব। ইতালিতে মুসোলিনী, স্পেনে ফ্রাঙ্কো, জার্মানীতে হিটলার ত্রমাগতবাজিয়ে চলেছেন যুদ্ধের জয়ডঙ্কা। তাদের সঙ্গে সামিল হয়েছে জাপান। সারা পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে যুদ্ধের সম্ভাবনা। সাম্রাজ্যব াদী অন্যান্য শক্তির বিদ্ধে হুংকার ধবনিত হলেও তাদের মূল শত্রু ছিল শিশুরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া। জাপান ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চীনের উপরে, ইউরোপের বাতাসেও ভাসছিল বাদের গন্ধ। ফ্যাসিবাদী তাণ্ডবের সম্ভাবনায় শংকিত হচ্ছিলেন পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ জাতিসমূহের আত্মঘাতী কলহ কলুষিত করবে পৃথিবীকে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। এ বিধবংসী যুদ্ধে রেহাই পাবে না কেউ--- এমন উদ্বেগ বিচলিত করছিল সারা দুনিয়াকে, বিচলিত হয়েছিলেন মনোরঞ্জনও। তাই তিনি কুক্ষেত্র যুদ্ধের চত্রব্যুহের পকে প্রকাশ করতে চাইলেন এ যুগের সংকটকে। তাই কুপাণ্ডবের জ্ঞাতিক্ষয়কারী যুদ্ধের মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণ বলেন ---“ব্যথা আজি বুঝিছে পাণ্ডব, ব্যথা আজিবুঝিছে কৌরব, ব্যথা আজি বুঝিছে বিরাট, ব্যথা আজি বুঝিছে যাদব।” এ সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটককার বলতে চাইছেন আত্মধবংসকারী যুদ্ধ শেষপর্যন্ত রেহাই দেয়না কাকে। এবং এ চত্রান্তের বলি হয় অসহায় অভিমন্যু যে আসলে বিশ্বের বিবেকী সরলতা। আমরা জানি কুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে উভয় দলের আঠার অক্ষৌহিনীর মধ্য জীবিতছিলেন মাত্র দশজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি শু হয়, তাহালে সমগ্র মানবজাতির পরিণতি যে একই হবে একথা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন মনোরঞ্জন, অন্য আরও অনেক মনীষীর মত। তাই শকুনির মত চরিত্রের মুখেও শোনা যায় এ সংলাপ---

ব্যথা শুধু আজিকার নহে,
যুগের সঞ্চিত ব্যথা,
যুগের সঞ্চিত গ্লানি
সে অনলে পোড়াও কেশব!
তারপর পার যদি আন নবযুগ--
তুলিতে মানবমন সমরের ঊর্দ্ধে
হিংসার উপরে।

বক্তব্য বলিষ্ঠ হলেও নাটকগুলো যে খুব একটা শিল্পিত, তা হয়ত নয়। তবু মনোরঞ্জনের এ নাট্যকীর্তিগুলোর মধ্যেধরা পড়েছে তাঁর প্রগতিশীল মনন ও দায়বদ্ধতা।

এ প্রগতিশীল দায়বদ্ধতার প্রমাণ ছাড়িয়ে রয়েছে তাঁর প্রবন্ধগুলোতেও। মঞ্চের উপর অভিনেতাদের ব্যক্তিগত রেষারেষিকে কেন্দ্র করে তিনি পৌঁছেছিলেন এ উপলব্ধিতে যে, “শাসনব্যবস্থা শাসনের ব্যবস্থাকে যতই পরিপাটি করে তুলুক, লালনের ব্যবস্থা যতক্ষণ ব্যক্তির হাত থেকে নিজের সমষ্টিগত হাতে না নিচ্ছে, ততক্ষণ ‘মেরে দেওয়া’ বিষের ক্রিয়া বন্ধ হচ্ছে না।” তিনি জানতেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজই জন্ম দেয় দৃষ্টিকটু প্রতিযোগিতার এবং সেটাই মঞ্চে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। তাই তিনি লেখেন, “নিজ নিজ সম্পদবৃদ্ধির প্রেরণায় মানুষের পৃথক পৃথক কর্মচেষ্টা মানুষকেযতদূর সম্ভব এগিয়ে এনে দিয়েছে। এখন বাহনই হয়েছে ভার। প্রয়োজন জন্মেছে সামাজিক, আয়োজন রয়ে গেছে ব্যক্তিগত। সেই হেতু যা দুর্ভোগ তাকে অনিবার্য মনে করে এতদিন বিধির বিধি বলে মাথা পেতে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু আয়োজনও সামাজিক হতে পারে, পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে তা পরীক্ষিত সত্য। শুধু জীবনযাত্রায় নয়, শিল্পকলা সকলদিকে সামাজিক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে, তা শুধু পরিম াপে নয়, রূপেও আলাদা হয়ে উঠেছে। কর্মচেষ্টার মূলে প্রতিযোগিতা বা ‘মেরে দেওয়া’ নীতির পরিবর্তে সহযোগিতা বা

'বাড়িয়ে - তোলা' নীতি পেয়েছে স্থান''। সাম্যবাদইযে মানবিকতা বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় এ প্রত্যয় থেকে তিনি ঘোষণা করেন, ''রাষ্ট্রশক্তিকে তাড়নশক্তি থেকে লালনশক্তিতে পরিণত করে তোলাই এখন সামাজিক প্রয়োজন।'' (মেরে দেওয়া) কিন্তু তিনি জানতেন রাষ্ট্রশক্তির এ পরিবর্তন সহজে ঘটে না, তার জন্যে চাই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। তাই 'গণনাট্য' প্রবন্ধে তিনি লেখেন, ''অতীত ও বর্তমানের আবর্জনা ঠেলে আদর্শ ভবিষ্যকে ফুটিয়ে তোলা গতানুগতিকতায় হয় না।... তাই চাই বিপ্লবী মন, আর ত্যাগী কর্মী। কমিউনিস্ট পার্টির মত অন্য কোনও ত্যাগী কর্মীর দলও একদিকে অগ্রসরহতে পারেন।'' তিনি আরও লেখেন একই প্রবন্ধে, ''রাজনীতি যেমন দিনকে দিন অর্থনীতি হয়ে উঠছে, তেননি দরিদ্র - সাধারণের জীবনমরণ সমস্যা তার সঙ্গে যুগগত হয়ে উঠছে, কৃষক মজুর আর দর্শক থাকছে না, বরং আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠছে। গণনাট্যও তেমনি আর ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকতে পারছে না, দৈনন্দিন জীবনমরণ সমস্যা নিয়েতাকে রূপ দিতে এগিয়ে আসছে।'' থিয়েটারের এ জীবনমুখী অগ্রসরতাকে স্বীকার করে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তার গুত্ব আজও কমে যায় নি। তিনি লিখেছেন, ''ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির ঝোঁক, বেশি অর্থনীতির দিকে। পূর্ণ সমাজতন্ত্র স্থাপন তাঁদের দূর লক্ষ্য। দেশের বর্তমান সংস্কৃতি সাধনাও সেই লক্ষাভিমুখী হওয়া উচিতমনে করে, তাদেরই উদ্যোগে, 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' স্থাপিত হয়েছে। সকল শ্রেণীর অগ্রসরকামী নাট্যশিল্পীর এতেযোগদান করে একে পুষ্ট করবার অধিকার রয়েছে, রাজনীতিক মতবাদে কমিউনিস্ট হবার প্রয়োজন নেই।'' 'গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠায় এক নতুন নাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে, এ ভাবনাটি গভীর তরঙ্গ তুলেছিল তাঁর মননে। তাঁর সাংস্কৃতিক সচেতনতা সীমাবদ্ধ ছিল না শুধু থিয়েটার ভাবনার মধ্যেই। চল্লিশের দশকের সেই অস্থির সময় তাঁকেমনোনিবিষ্ট করেছিল নানা ব্যাপারেই। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব, দাঙ্গার সম্ভাবনা--- সমকালীন এ সব কিছুই নিরন্তর পীড়িত করছিল তাঁকে। সেই ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দেই, তথাকথিত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে'র তিন বছর আগে, তিনি হিন্দুমুসলমান বৈরী নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং পৌঁছতে চেয়েছিলেন সমস্যাটির মূল কেন্দ্রে এবং এজন্যে যে মূলত দায়ী হিন্দুদের সংকীর্ণতা একথা কবুল করতেও দ্বিধা করেন নি। এ মনোভাবের জন্যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার প্রেক্ষিতে ঘোষণা করেছিলেন, ''কলকাতার দাঙ্গার জন্যে আমি লজ্জিত'' এবং ''দাঙ্গার গোড়াকার মনোবৃত্তি ভীতা।'' সে সময়ে সাহস করে খুব কম মানুষেই এমন দ্ব্যর্থহীন স্বীকারোক্তি করতেপেরেছিলেন। বাঙালি সংস্কৃতিতে মুসলমান শ্রমিক ও কৃষকদের অবদানের কথাও আলোচনা করেছেন যুক্তিনিষ্ঠ মননশীলতায়। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতিই যে বাঙালি সংস্কৃতি এ উপলব্ধির গভীরে আজ কি আমরা উপনীতহতে পেরেছি তেমন করে? প্রায় একই সময়ে 'অচল অবস্থা কিসে?' প্রবন্ধে ঘটেছে সমকালীন রাজনৈতিক সংশয়েরকিছু প্রতিফলন। এখানেই তিনি লিখেছেন, ''সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি টলটলায়মান মনে করলেও শস্ত্রনৈতিক ভিত্তি এখনো দৃঢ়। ধনতন্ত্রের অর্থনীতির গোড়ায় গলদ রয়েছে, কালে তার আপনভারে আপনি ভেঙে পড়ার কথা। কিন্তু মার্কস এঙ্গেস, লেলিনের মতে না ভাঙ্গতেও পারে, তাই ধাক্কা দেবার প্রয়োজন। ...ভারতবর্ষে এই ধাক্কা দিতেপারে উদ্বুদ্ধ গণশক্তি।'

এভাবেই তিনি সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতির নানান বিষয়ে প্রকাশ করে গেছেন যুক্তিনিষ্ঠ অভিমত। তাই সমকালীন সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রেক্ষিতে শুধু দেখলে চলে না তাঁকে তাঁর এই দায়বদ্ধ পক্ষপাত তাঁকে অনিবার্যভাবে পৌঁছেদিতে 'গণনাট্য সংঘ' প্রযোজিত 'বাস্তুভিটা' নাটকে মহেন্দ্র মাস্টারের চরিত্রচিত্রণে, 'নবান্ন' অথবা 'পথিক' নাটকে যথাক্রমে কালীধন ধারা ও রাসু ধর-এ। শেষ জীবনে তিনি জড়িত ছিলেন 'গণনাট্য সংঘ' ও 'বহুরূপী'র সঙ্গে। 'বহুরূপী' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিও ছিলেন তিনি। তাই যখন প্রয়াত হন মনোরঞ্জন, গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় মুখপত্র লিখেছিল "ever since its foundation in 1943 he was, in fair weather and in foul its unfailing guide, philosopher and friend" । বাংলা প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের সত্যই তিনি ছিলেন 'বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক।'